সাওমের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন

ডক্টর মোহাম্মদ ইদ্রিস

ইসলাম পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হলো সাওম। কালিমার ঘোষণা দেওয়া, সালাত আদায় করা, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেওয়া, সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করা ও রমযানের সাওম পালন করা। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভই আলাদাভাবে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে, কিন্তু তন্মমধ্য 'সাওম' একটু আলাদা। যার পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন: 'মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম ছাড়া, তা শুধুই আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব।' (সহীহ মুসলিম) আল-কুরআনের ভাষায় অত্যন্ত ফযিলত ও মর্যাদাপূর্ণ এই সাওমেরর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহর তা'য়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আবার যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও অপছন্দনীয় চিন্তা, কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষার মনোভাবকে তাকওয়া বলা হয়। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত বা গাইড হলো রমযান মাসে অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন। আলোচ্য নিবন্ধে সাওমের পরিচয়, সাওমের উদ্দেশ্য, তাকওয়ার অর্থ, ও সাওমের তাৎপর্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. সাওমের পরিচয়

আরবী ভাষায় 'সিয়াম' শব্দের আভিধানিক অর্থ- বিরত-নিবৃত থাকা, পরিত্যাগ করা বা ফিরিয়ে রাখা ইত্যাদি। (আল-মুজামুল ওয়াসীত) সাওমের ফার্সী প্রতিশব্দ রোযা। আভিধানিক রোযা সিয়ামের সমার্থবোধক না হলেও ফার্সী, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় সিয়ামের জায়গায় 'রোযা' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়ে আসছে। শরীয়তের পরিভাষায় সিয়াম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজেকে মিথ্যাচার, যৌনাচার ও পানাহার থেকে বিরত রাখা। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত ব্যতীত কেউ সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকলে তাকে উপবাস বলা যেতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সওম বা রোযা বলা যায় না। আবার সিয়াম বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাও বুঝায়। যেমনটি সিয়াম সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও (হিসাব নিকাশের) চেতনাসহ রোযা রাখবে তার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) আবার ব্যর্থ সিয়ামের কথা উল্লেখ করে হাদীসে বলা হয়েছে: 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলনা, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন আল্লাহর নিকট নেই।' (বুখারী)

মাহে রমযান আরবী মাসের নবম মাস। রমযান শব্দটি আরবি 'রময' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'রময' শব্দের সাথে অতিরিক্ত আলিফ-নুন যুক্ত হয়ে 'রমযান' হয়েছে। এর অর্থ- দহন করা, জ্বালায়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। অথাৎ প্রবৃত্তির তারণায় মানুষের জমাকৃত পাপ এ মাসে দহন করে, জ্বালায়ে, পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে এ মাসকে রমযান মাস বলা হয়। সাওম ফরযের বিধান ও সাওমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হলো, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের ওপর। এ থেকে আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

২. সাওমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী ও তাদের উম্মাতের উপর এ সিয়াম ফরয করেছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতে বলেন: 'ও হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হলো, যেভাবে ফরজ হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।' এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রোযা পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয হিসেবেই নির্ধারিত ছিল। তবে তার সংখ্যা এবং সময়ের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। হযরত আদম আলাইহিমুস সালাম থেকে হযরত নূহ আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪,ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিধান ছিল। একে বলা হতো 'আইয়্যেমে বেয' উক্ত দিবসে আমাদের জন্য রোযা রাখা নফল। হযরত মুসা আলাইহিমুস সালামের প্রতি তূর পাহাড়ে অবস্থানের সময় ৪০ দিন রোযা পালনের নির্দেশ ছিল। ১০ই মুহার্‌রম তারিখে আশুরার রোযা রাখার বিধান ছিল। হযরত মারিয়াম (আ:) এর জন্য মানুষের সাথে কথা বলা না বলাও সিয়ামের আহকামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:'অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোন লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম

করুণাময়ের জন্য সিয়ামের মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না'। (সূরা মারিয়াম: ২৬)

হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালাম এক দিন পর পর রোযা রাখতেন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন: মহান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় রোযা হলো দাঊদ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফতার করতেন (একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন)। আর মহান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সালাত হলো দাঊদ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সালাত। তিনি রাতের অর্ধেক ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করতেন আবার এক ষষ্ঠমাংশ ঘুমাতেন।' (বুখারী)

এ আলোচনার দ্বারা বোঝা যায়, রোযা পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। পবিত্র এই বাক্যাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা বুঝিয়ে দিলেন, রোযা তাঁর কাছে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা তিনি সকল উম্মতের জন্যই বাধ্যতামূলক রেখেছিলেন। এ কষ্টকর ইবাদত শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই প্রবর্তন করা হয়নি। মানব-চরিত্র সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যক ইবাদত পদ্ধতি। তাই রোযা যুগে যুগে সকল উম্মতের জন্যই অবশ্য পালনীয় ইবাদত ছিল। আর কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রোযা ফরয করলেন, তাও তিনি সূরা আল-বাকারার ১৮৩ নম্বার আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা কেন ? রোযা ফরয করলেন, তা পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'রমজান মাস, এতেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানব জাতির জন্য হিদায়েত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

সিয়াম পালনের অপহির্য়তা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫) সিয়ামের আহকাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) সিয়াম ফরযের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'এ থেকে আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

৩. সাওমের উদ্দেশ্য

সাওম ফরযের উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন, 'যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার'- এ আয়াতাংশেই আল্লাহ তা'য়ালা রোযা ফরয করার উদ্দেশ্য মু'মিনদের তাকওয়া অর্জন বলে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর তা'য়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত বা গাইড হলো সিয়ামের মাসে অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।' (সূরা আল-বাকারা: ২) তাকওয়া হলো মানুষের জীবনের প্রধান মর্যাদার মাপকাঠি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩) আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য পরকালীর সফলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হে (রাসূল) বলে দাও! দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না।' (সূরা আন-নিসা: ৭৭)

আল-হাদীসে তাকওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র ও নগণ্য গুণাহ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ) আল-হাদীসে তাকওয়া সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে: 'আতিয়া সা'আদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন বান্দাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকিদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে গুণাহর কাজে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কায় ঐসব কাজও পরিত্যাগ করে যাবে যাতে কোন গুণাহ নেই। (তিরমিযী) সুতরাং আল-কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে

পারি তাকওয়া হলো মানুষের জীবনের প্রধান মর্যাদার মাপকাঠি আর সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত বা গাইড হলো সিয়াম সাধনার মাসে অবতীর্ণ মহা গ্রন্থ আল-কুরআন।

৪. তাকওয়ার অর্থ

তাকওয়া অর্থ- বিরত থাকা, ভয় করা, পরহেজগারী অবলম্বন করা। ইসলামী নৈতিকতার তৃতীয় স্তর হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া বলতে সাধারণত আল্লাহর ভীতি বুঝায়। পরিভায়ায় আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও অপছন্দনীয় চিন্তা, কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষার মনোভাবকে তাকওয়া বলা হয়। হজরত ওমর (রাঃ) তাকওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আপনি কি কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) পুনরায় প্রশ্ন করেন, তখন আপনি কি করেছেন? জবাবে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করলাম। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, এটাই তাকওয়া। আর যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় মুত্তাকী।'

তাকওয়ার শাব্দিক তরজমা যদিও আল্লাহর ভীতি হয়ে থাকে, অথচ তাকওয়ার অর্থ- নিছক ভয়-ভীতি নয়। তাকওয়া এক গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। আরবী ভাষায় ওয়াও, কাফ এবং ইয়া এই তিনটি হরফ দ্বারা গঠিত শব্দটি একটু রূপান্তরিত হয়ে যখন 'বেকায়াতুন' হয় তখন এর অর্থ হয় বেঁচে থাকা, মুক্তি চাওয়া বা নিস্কৃতি পাওয়া, রক্ষা করা ইত্যাদী। যেমন- আমরা আল্লাহর কাছে কুরআনের ভাষায় ফরিয়াদ করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্য দু'য়া করি: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও। আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।' (সূরা আল-বাকারা: ২০১) এখানে 'অকিনা' শব্দটি যার অর্থ- আমাদেরকে নিস্কৃতি দাও, আমাদেরকে রক্ষা কর, এ অর্থে ফরিয়াদ করা হয়েছে, এ শব্দটি তাকওয়ার মুল ধাতু থেকে রূপান্তরিত। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ:

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও' (সূরা আত-তাহরীম: ৬) উক্ত নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা তাকওয়ার মুল ধাতু থেকে গঠিত "কু" শব্দকে 'বাঁচাও' বা 'হিফাযত কর' এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে নিজেকে হিফাযত বা মুক্ত রাখতে পারবে তারাই মূলত সফলকাম।' (সূরা আত-তাবাগুন: ১৬) এ ক্ষেত্রে তাকওয়ার মুল ধাতু থেকে গঠিত একটি শব্দকে 'হিফাযত বা মুক্ত রাখার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ভাবে আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এর প্রয়োগধারা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তাকওয়ার মূল অর্থ- বেঁচে থাকা, মুক্তি লাভ করা, বা নিস্কৃতি লাভ করা। সুরা বাকারার আরেকটি আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে যে, তাকওয়ার অর্থ- মুক্তি লাভ করা, বা নিস্কৃতি লাভ করা। যেমন-মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হও বা পরিত্রাণ পাও।' (সূরা আল-বাকারা: ২১)

শরীয়তে 'তাকওয়া' শব্দটি এমন এক অভ্যন্তরীণ অনুভূতির নাম, যা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং মহব্বত থেকে সৃষ্টি হয়। এক কথায় একে আল্লাহভীতিও বলা হয়। আল্লাহর ভয় এবং মহব্বত- এ দুইটি বিষয়ই মানুষের ঈমানের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তি, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়াবহ পরিণাম এবং গযব ও শাস্তিদানের ক্ষমতার প্রতি ঈমান থেকেই আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। আবার আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলীর প্রতি ঈমান এবং তাঁর অবারিত রহমত অনুগ্রহের কারণে তাঁর জন্য অন্তরে মহব্বত জাগ্রত হয়। এই ভয় ও মহব্বতের সংমিশ্রণে যে আন্তরিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তা হলো তাকওয়া।

একজন মানুষ যখন তাকওয়া অবলম্বন করে মুত্তাকী হয়, তখন আভ্যন্তরীণ ভয় মহব্বত তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার যাবতীয় কাজ থেকে বিরত এবং তাঁর পছন্দনীয় যাবতীয় নেক কাজ রত রাখে। এভাবে তাকওয়ার কারণেই সে গুনাহ থেকে বিরত থেকে সওয়াবের কাজে লেগে থাকে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উৎস হল তাকওয়া। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'পূণ্য ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, আর যা গুণাহ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল-মায়েদা: ২)

আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্য মু'মিনরা রোযা রেখে তাকওয়া অর্জন করবে। কারণ তাকওয়ার অধিকারী হলেই মানুষ তার সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে। কারণ তাকওয়া এমন এক গুণ, যা নির্দিষ্ট কোন কাজ, পোশাক বা সীমাবদ্ধ কয়েকটি আমলের নাম নয়; বরং তাকওয়া হল মু'মিন জীবনের সর্বব্যাপী এক অবিচ্ছেদ্য গুণ। যা তার চিন্তায়, কথায় ও কাজে প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয়ে সব সময়ের জন্যই থাকবে। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল

পর্যায়েই আল্লাহর ভয় তাকে নিয়ন্ত্রত করবে। জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে, প্রতিটি কথা কাজে ও চিন্তায় যদি সে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত থাকে, তবেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হবে আল্লাহর ইবাদত পরিপূর্ণ। তার প্রতিটি কাজ পরিণত হবে ইবাদতে, যে এবাদত করার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে শুধু আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

মানুষ আল্লাহর সার্বক্ষণিক এবাদতে রত থাকবে- মানুষ সৃষ্টির পেছনে এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূরণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ জীবন ও জগতের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে আল্লাহর ভয় স্মরণে রেখে, তাকওয়া অনুসরণ করে। তাই আল্লাহর সার্বক্ষণিক অনুগত বান্দা হবার জন্য তাকওয়া অর্জন অপরিহার্য। আর মানুষকে নিকটবর্তী বা তাকওয়ায় অভ্যস্ত করতেই আল্লাহ রোযা ফরয করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৬)

৫. তাকওয়ার ক্ষেত্র

সম্মানিত ভাই/বোনেরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকওয়া অর্থ জেনে নিলাম। এবার আমরা তাকওয়ার পরিধি বা ক্ষেত্র জেনে নিব ইনশাআল্লাহ। তাকওয়ার পরিধি বা ক্ষেত্র সীমাহীন বিস্তৃত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের আহবান করে বলেন: 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যে-রূপ ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

এ দুনিয়ায় মানুষের হায়াত মাত্র ৬০ -৭০ বছর। শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার মেধা, যোগ্যতা ও শ্রম পুরাপুরি বিনিয়োগ করে। কিন্তু সীমাহীন পরকালীন জীবনের জন্য তার কতটুকু সময় ব্যয় হয়? আল্লাহ তা'য়ালা কি তার মনের গোপন অবস্থা জানেন না? সব খবর রাখেন না? যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন না? আল-কুরআন এ সব প্রশ্নের সুন্দরতম উত্তর দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে বলেন: 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সূরা আল-হাশর: ১৮)

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর অঙ্গীকার, যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন। যখন তোমরা বললে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অবগত।' (সূরা আল-মায়েদা: ৭) মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'আর আল্লাহ কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ও মহা শ্রবণকারী। (সূরা আল-বাকারা: ২৩৩) আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর আল্লাহ কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। (সূরা আল-বাকারা: ২৩১)

তাকওয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে। (সূরা আল-বাকারা: ৩-৪) সালাত কায়েম, রিয্ক থেকে ব্যয়, কিতাবের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন এই চারটি বিষয় ছাড়াও তাকওয়ার আরও কয়েকটি ক্ষেত্র বা মুত্তাকীর কাজ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'বরং কল্যাণ আছে এতে যারা আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান পোষণ করবে এবং তার ভালবাসার্থে ধন–সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক মুক্তকামী ক্রীতদাসদেরকে দান করবে আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখে-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী'। (সূরা আল-বাকারা: ১৭৭)

৬. তাকওয়ার উৎস

তাকওয়ার সীমাহীন বিস্তৃত পরিধি বা ক্ষেত্র সংক্ষেপে আলোচনার পর এবার আমরা এর উৎস সম্পর্কে জেনে নেব। তাকওয়ার মূল উৎস হলো আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি। আখিরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কোন ব্যক্তি থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না আর কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।' (সূরা আল-বাকারা: ১২৩) মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'আর

আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াহুড়া করে দু'দিনে চলে আসবে। তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে (একদিন) তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।' (সূরা আল-বাকারা: ২০৩)

তাকওয়ার মূল উৎস হলো আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি হলেও এর প্রয়োগ কেবলমাত্র ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সাধনা ও পরকালীন মুক্তির চিন্তা চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ব্যক্তিজীবনে এর কার্যকরীতা ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে ব্যবহারিক জীবনে তাকওয়ার সঠিক প্রয়োগের উপর। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সুরা নিসার প্রথমে বলেন: 'তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।' (সূরা আন-নিসা: ১)

এ আয়াতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমনকি আত্মীয়ের-স্বজনের হক বা অধিকারের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম সমাজে বিয়ে-সাদীর মজলিসে খুতবা দেওয়ার সময় এ আয়াতে কারীমাকে উল্লেখ করা হয় যার উদ্দেশ্য থাকে স্বামী-স্ত্রী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়ের-স্বজনের সাথে আচার আচরণে যেন আল্লাহ তা'য়ালার এ নির্দেশ পালন করা হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।'।(সূরা আল-হাশর: ৭) এখানে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত আদর্শের সার্বিক দিক মেনে চলা ও না মানার ফলাফল ও পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে 'আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর'। তেমনি মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা:'তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা সর্ব শক্তি দিয়ে আঁকরে ধরো এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা মুক্তি লাভে সক্ষম হতে পার'। (সূরা আল-বাকারা: ৬৩)

এ আয়াতে আমাদের জীবনে ব্যাপক পরিসরে আল্লাহর বিধান মান্য করে চলাকেই মুক্তির মুক্তির উপায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা: 'আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।' (সূরা আল-বাকারা: ১৭৯) এ আয়াতে বিচারের ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা: 'নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (সূরা আল-হুজুরাত: ১০) এ আয়াতে সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা: 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না যা অন্তরে ব্যাধি আছে এমন লোককে প্রলুব্ধ করবে, বরং সোজা-স্পষ্ট কথা বল।' (আল-আহযাব: ৩২) এ আয়াতেও সমাজে শান্তি শৃংখালা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: 'এবং যখন তাদের কাছে (নবীর স্ত্রীদের কাছে) কিছু চাইতে হয় তা চাও পর্দার আড়াল থেকে। এটি তোমাদের ও তাদের মনের জন্য পবিত্রতম পদ্ধতি।' (আল-আহযাব: ৫৩) এ আয়াতে সমাজিক অর্থে তাকওয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যক্তি ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহর নির্দেশিকা মানার ব্যাপারে আমাদের মন মগজকে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসাবে আল্লাহর ভীতি ও আয়াতে জবাবদিহিতার অনুভূতিকেই প্রয়োগের করা হয়েছে।

৭. তাকওয়ার ফল বা প্রতিদান

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে প্রত্যাশা করে স্বাচ্ছন্দ, পর্যাপ্ত রিযিক, কাজকর্মে সহজসাধ্যতা, ষড়যন্তের মোকাবেলায় নিরাপত্তা, আর তাকওয়াবান মানুষের এসব চাওয়া পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' (সূরা আত-তলাক: ৩) কাজকে সহজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।' (সূরা আত-তলাক: ৪) বরকত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং

তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।' (সূরা আল-আরাফ: ৯৬)

ষড়যন্তের মোকাবেলায় নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী।' (সূরা আলে-ইমরান: ১২০) বন্ধুত্ব গ্রহনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'তার বন্ধু তো শুধু মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।' (সূরা আল-আনফাল: ৩৪) ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে-ইমরান: ৭৬)

আল্লাহর সাহচর্য লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'আর আল্লাহ কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।' (সূরা আল-বাকারা: ১৯৪) তাকওয়া আল্লাহর পথের পাথেয় হিসাবে ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।' (সূরা আল-বাকারা: ১৯৭) তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।' (সূরা আল-আরাফ: ২০১)

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেমন প্রত্যাশা করে স্বাচ্ছন্দ, পর্যাপ্ত রিযিক, কাজকর্মে সহজসাধ্যতা, ষড়যন্তের মোকাবেলায় নিরাপত্তা তেমনি প্রত্যাশা করে পরকালের সফলতা, আর তাকওয়াবান মানুষের পরকালীন জীবনের সফলতা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।' (সূরা আল-বাকারা: ২২৩) ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হে মু'মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।' (সূরা আল-আনফাল: ২৯) মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 'আল্লাহভীরু লোকদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতে থাকবে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানি, কখনো বিস্বাদ হবে না এমন দুধ, পান কারীদের জন্য সুস্বাদ সুপেয় পানি এবং স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধুপ্রবাহিত ঝরণাধারা। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি এবং মহান প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা।' (সূরা মুহাম্মদ: ১৫)

৮. সাওমের তাৎপর্য

কষ্ট সহ্য করে অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা রোযা থেকে বিশেষভাবে যা কিছু পেয়ে থাকি, তা আমাদের আল্লাহর প্রকৃত বান্দা বা সন্তোষভাজন বান্দায় পরিণত করতে সহায়ক হয়। সিয়াম বা রোযা দেহের দাবিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করে। কু-রিপু দমনে রোযা এক শক্তিশালী হাতিয়ার। নফসের দাবিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সংযম সাধনার শিক্ষা দেয় রোযা, মানুষের শরীরের মৌলিক তিনটি দাবী খাদ্য, যৌন প্রবৃত্তি নিবৃতকরণ, আরাম বিশ্রাম। এ দাবিগুলো যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিত সম্ভোগের মাত্রায় আদায়ের ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশিত হয়। কর্মশক্তি জাগ্রত হয়, বিশ্ব জগতের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের উপযোগী হয়, কিন্তু যখনই মানুষের ভেতরে কু-রিপু প্রবল হয়, তখন দেহের এ দাবিগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চল যায়। এই দাবি পূরণের তখন তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে সে মানব জীবনের মৌলিক দায়িত্বকর্তব্য ভুলে যায়, তার মনুষ্যত্ব পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসে, তার দ্বারা বিশ্ব-জগতের কেবল অকল্যাণই সাধিত হয়।

সমাপনীঃ রোযা সকল মু'মিনকে অপরের প্রতি সহানুভুতির শিক্ষা দেয়। ফলে গরীবের প্রতি ধনীদের সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, সংঘবদ্ধভাবে দীনের রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য যে নৈতিক শৃংখলার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, রোযা সেই প্রশিক্ষণই দিয়ে থাকে মু'মিনদের। আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা তাকে পরিপূর্ণ মু'মিনে পরিণত করে। এভাবেই তাকওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা রোযা রেখে বহুমুখী শিক্ষা লাভ করতে পারি। তবে এ শিক্ষাগুলো আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে সেই উদ্দেশ্য ব্যস্তবায়নের চেষ্টা করব। আর তা না থাকলে শুধু সকাল সন্ধ্যা উপবাসে থাকলে কোন শিক্ষা বা উপকারই আমরা লাভ করতে পারব না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সাওমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে তাকওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে রমযান মাসের পূর্ণ ফযিলত লাভ করার এবং জীবনে সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, সাঁথিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা। ই-মেইল: drmidris78@gmail.com